অমর একুশে বইমেলার সাহিত্যিক মুখপত্র

সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকা

অর্ধ-সাপ্তাহিক

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ২ । রবিবার । ১ মার্চ ২০২৬ । ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ২০ টাকা

www.sharetindinerpotrika.com

থ্রিলার সংখ্যা

থ্রিলারের জন্য ভালোবাসা

ফাহাদ আল আবদুল্লাহ

প্রচ্ছদ : আন্দামান বাগচি

প্রধান রচনা

হাল আমলে বইয়ের দোকান, বইমেলা কিংবা অনলাইন বুকশপ—যেখানেই যান থ্রিলার বইয়ের রমরমা। লোকে থ্রিলার পড়েও বেশি, নাকও সিঁটকায় এই থ্রিলার নিয়েই। বইয়ের দোকানের তাকে থরে থরে সাজানো থাকে এই থ্রিলার, বেস্টসেলার তালিকার দখল থাকে থ্রিলারের হাতে, সিনেমার গল্পে থ্রিলার উপন্যাস এমনকি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতেও থ্রিলার। এতকিছুর পরেও ‘সাহিত্যপাড়া’য় এই থ্রিলার যেন ব্রাত্য। কোটি কোটি মানুষের প্রিয় এই সাহিত্য যেন বোদ্ধাদের কাছে আসল সাহিত্য হতেই পারছে না। গাদা গাদা পাঠক থাকার পরেও যেন থ্রিলারের বক্তব্যের কোনো গভীরতা নেই, তথাকথিত ভারী সাহিত্যের গুরুভার কথাবার্তা যেন থ্রিলার বলতেই পারে না; অন্তত সেটিই অধিকাংশ বোদ্ধার ধারণা।

আমাদের সাহিত্য বিশারদদের আড্ডায় কিন্তু ধীরগতির গল্পকে গভীর জীবনবোধ হিসেবে বিবেচনা করার প্রশিক্ষণ আছে। যে সাহিত্যে দাঁত ফোটানো দুরূহ, সে সাহিত্যই জীবনবোধে টইটুম্বুর এমন চিন্তাও বাড়বাড়ন্ত।

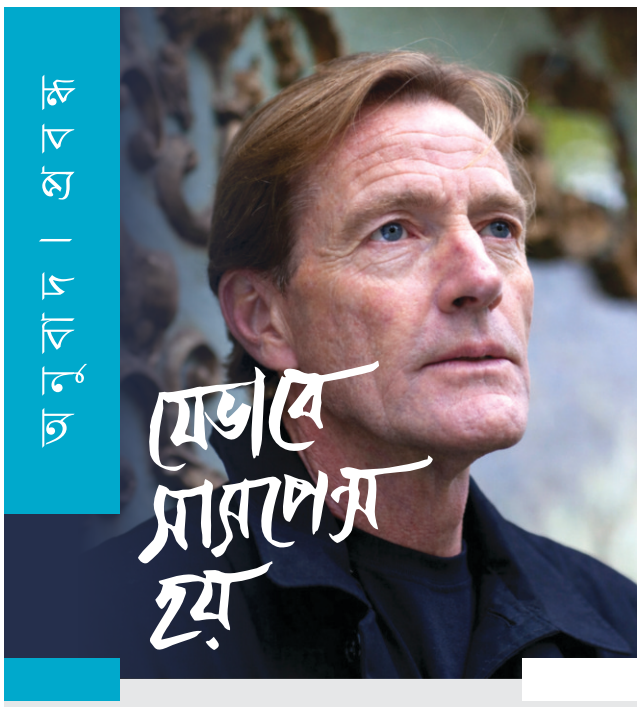

এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

অনুবাদ । প্রবন্ধ

যেভাবে সাসপেন্স হয়

লি চাইল্ড

সাসপেন্স বা টানটান উত্তেজনা সৃষ্টির রহস্যটি ঠিক কোথায়? লেখক হিসেবে আমাকে প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। বিষয়টি কেবল তথাকথিত রহস্য উপন্যাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। উপন্যাস বিষয়ের আঙ্গিকে যে ঘরানারই হোক না কেন, তার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি। এই চালিকাশক্তি পাঠককে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার রসদ জোগাবে। তবে আমাকে যখন এ প্রশ্ন করা হয় তখন গোটা প্রশ্নটাকেই আমার ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। সবাই জিজ্ঞেস করেন, ‘সাসপেন্স কীভাবে তৈরি করবেন?’ এমন প্রশ্ন যেকোনো লেখককে অত্যন্ত জটিল ও বিভ্রান্তিকর এক পথে ঠেলে দেয়।

কেন? কারণ, এই প্রশ্নটা অনেকটা ‘কীভাবে কেক বানাবেন’ এমন ধাঁচের হয়ে যায়। আমরা জানি, সুস্বাদু কেক বানানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত আমরা মনে করি, উপকরণের মান যত উন্নত হবে, কেকটি তত সুস্বাদু হবে। এই মনে করা থেকে একটা বিশ্বাসও। পরম মমতা দিয়ে ময়দা, চিনি আর মাখনের সুষম মিশ্রণ ঘটিয়ে নির্দিষ্ট তাপে ওভেনে সেঁকে নিলেই আমরা একটা নিখুঁত কেক পাব। এমন প্রথাগত ধারণা তরুণ লেখকদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের বলা হয়, থ্রিলার উপন্যাসের ‘উপকরণ’ নিয়ে মগ্ন থাকো। এমন চরিত্র নির্মাণ করো যাদের বিপদে পাঠক বিচলিত হয়ে পড়বে। থ্রিলারে ওই চরিত্রের আবেগ ও বিপন্ন অবস্থা অনেকটা ওভেনের আঁচের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অনেকে ভাবেন, চরিত্রের গভীরতা আর কাহিনির জটিল বিন্যাসই খাঁটি সাসপেন্সের চাবিকাঠি।

কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে, থ্রিলারে সাসপেন্স তৈরির বিষয়টি অনেক সহজ ও সোজাসাপ্টা।

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

সাক্ষাৎকার

থ্রিলারও সাহিত্য, তবে এর ফাংশন আলাদা

—মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন একাধারে অনুবাদক, লেখক এবং প্রকাশক। বাংলাদেশে মৌলিক থ্রিলারের পথিকৃৎ বলেই তিনি সমধিক পরিচিত। মূলত *নেমেসিস* নামক মৌলিক থ্রিলারের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এখন পর্যন্ত ১১টি মৌলিক থ্রিলার লেখার পাশাপাশি ২৬টি বইয়ের অনুবাদও করেছেন। তাঁর লেখা থ্রিলার অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ওয়েব সিরিজও। *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকা*র প্রতিনিধি **মার্যিউর রহমান চৌধুরী**র মুখোমুখি হয়েছেন এ লেখক

পোর্ট্রেট : রাজীব রাজু

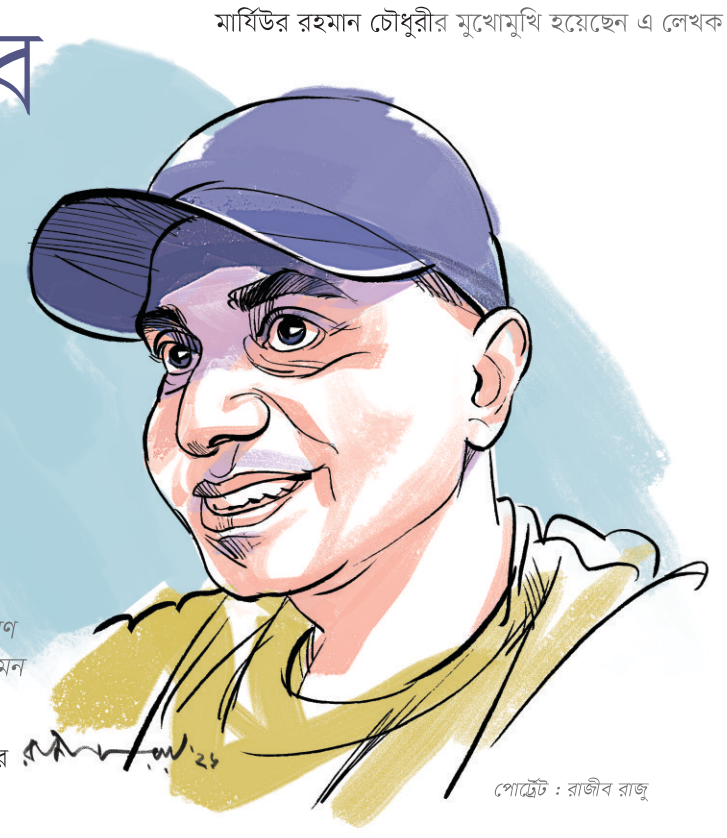

শুরুতে জেনে নিতে চাই আসলে কেমন আছেন? কারণ একটা নতুন সময় চলছে। আর এই নতুন সময়ে ব্যস্ততা কেমন যাচ্ছে সেটাই জরুরি হয়ে যায়।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন : বেশ ভালো আছি। বরাবরের মতোই লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের সময়টাই এমন যে এখন অনেক কিছু খারাপ আছে। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আমি

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

১ম পৃষ্ঠার পর

থ্রিলারও সাহিত্য, তবে...

বরাবরই ভালো থাকার চেষ্টা করি। এই ভালোলাগার জায়গা অবশ্যই লেখালেখি। এটা একটা পরিচয়। এই পরিচয়ের বিষয়ে আমি ফেসবুকে যেমন সরব তেমনি সাক্ষাৎকারে বেশ লাজুক।

আপনাকে আমরা বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ থ্রিলার লেখক হিসেবে চিনি। আপনার কেন মনে হলো আপনি থ্রিলার নিয়ে কাজ করবেন?

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন : এসব নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে অনেক কিছুই বলা যায়। এগুলো নিয়ে অনেকবার বলেছি। আমি আমার মতো করে কাজ করেছি। করেছি সচেতনভাবে। তবে শুরুটা যে একদম সচেতন ছিল এমনটি আমি বলব না। কারণ সত্যিটা হলো, আমি সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই থ্রিলার জনরা নিয়ে লিখতে শুরু করি। এক্ষেত্রে ভালোলাগার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আমি যখন থ্রিলার লিখতে শুরু করি, তখন হয়তো অবচেতনে অনেক কিছু ছিল—কীভাবে বলা যায়...আমার ভালোলাগার একটা বিষয় ছিল। মানে এই ধরনের গল্প লেখার মানসিকতা আমার ছিল। আবার অভিজ্ঞতাও ছিল। যখন প্রথম লেখা শুরু করি, তখন দেশে মৌলিক থ্রিলার ছিলই না বলা চলে। মানে কাঠামোগতভাবে দেশে যে থ্রিলার ছিল সেগুলো আসলে বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা হতো। প্রেক্ষাপটটা একদমই বিদেশি ছিল। কিন্তু দেশীয় আবহ দেওয়া হতো। বিষয়টা আমাকে সবসময়ই একটা মৌলিক জায়গা থেকে ভাবাত। ভাবাত, কারণ পৃথিবীর সব দেশেই থ্রিলার লেখা হয়। একেকটা দেশে একেকভাবে থ্রিলারকে লেখা হয়। ভিজ্যুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনেও তাই থ্রিলারের এই সাংস্কৃতিক আবহ চলে আসে। আমাদের সংস্কৃতিরও তো এই দিকগুলো আছে। তাহলে আমাদের কেন ছায়া অবলম্বন করে লিখতে হবে? আমার মনে আছে, বেশ নামকরা একজন থ্রিলার লেখক বলতেন যে, বাংলাদেশে আসলে মৌলিক কোনো থ্রিলার লেখক নেই। তিনি বলতে চেয়েছেন, থ্রিলার লেখার মতো লোকই নেই। বিষয়টাকে আমি জেদ হিসেবে নিয়েছি। আবার এটা এক ধরনের অনুপ্রেরণাও। আমি যে লিখতে পারি, সেটা দেখিয়ে দেয়ার জেদ আর কি।

এই মৌলিক থ্রিলার লেখার পথটা নিশ্চয় মসৃণ ছিল না?

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন : ছিল না তো অবশ্যই। একটু আগেও তো বললাম। বেশ নামকরা অনেকেই বলতেন দেশে মৌলিক থ্রিলার লেখার মতো লোক নেই। এই প্রতিক্রিয়া কারা দেখিয়েছেন সেটি পাঠক বা থ্রিলারের একনিষ্ঠ ভক্তরা কিন্তু জানেন। এখনে খোলাসা করে বলার কিছু নেই। যখনই কেউ শুনত মৌলিক থ্রিলার, তখন এক ধরনের গাত্রদাহ হতো। আমাদের দেশে আবার কিছু পাঠক নিজেদের সিরিয়াস সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ভাবেন। তারা থ্রিলারকে সাহিত্যই ভাবেন না। এখনও যে অনেকে এভাবে দেখেন না, এমনটি নয়। তারা বেশ ভালোভাবেই দেখেন। থ্রিলারও সাহিত্য; তবে এটার ফাংশন আলাদা, গ্রামার আলাদা। এখন সমালোচনা আসবেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি, যে সমালোচনাগুলো আসে পপুলার কালচার থেকে। মানে ফেসবুক আর ইউটিউব থেকে আসে। অনেক সময় পেশাদার জায়গা থেকে আসে না। পেশাদার জায়গা থেকে যেহেতু আসে না, তাই আমি সমালোচনার জবাব দেই না। এই বিষয়গুলোকে আমি বরাবরই ভার্চুয়াল জগতের বলেই ভাবতে পছন্দ করি। থ্রিলারের মতোই অ্যাকচুয়াল কিছু এগুলো নয়। আমার কাজ লিখে যাওয়া এবং মৌলিক থ্রিলারে বৈচিত্র্য আনা। সেই কাজটাতেই মনোযোগ দিতে চাই। কোনো লেখকের যাত্রাই আসলে মসৃণ না। কিন্তু তার কাজের ভাবনার জায়গাটি থেকে সরে গেলে পথচ্যুত হয়ে যাবে। নতুন কিছু আর আসবে না।

আমি যখন থ্রিলার লিখতে শুরু করি, তখন হয়তো অবচেতনে অনেক কিছু ছিল—কীভাবে বলা যায়...আমার ভালোলাগার একটা বিষয় ছিল। মানে এই ধরনের গল্প লেখার মানসিকতা আমার ছিল। আবার অভিজ্ঞতাও ছিল

আচ্ছা। আপনি তাহলে লেখকসত্তাটার বিষয়ে আসলে অবচেতনে অনেক সচেতন। কিন্তু অবচেতনের প্রসঙ্গই যখন এলো, তখন ধরে নিতে হয় যে শৈশবের কোনো একটা ঘটনা আপনাকে লেখক হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেটা কি আমাদের সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার পাঠকদের জানাবেন?

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন : খুব কঠিন প্রশ্ন। নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা এখানে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে কি না আমি জানি না। অবচেতনের প্রসঙ্গ এলে আসলে বলা কঠিন। আমি প্রচুর বই পড়তাম। পড়তে পড়তেই আসলে একটা সময় আমার মধ্যে গল্প লেখার ইচ্ছে জেগেছিল। তবে আমি একটা জিনিস বুঝেছি। লেখা শুরুর আগে আমাকে অনেক পড়তে হবে। মানে এখন যতটুকু জানি, তার চেয়ে আরও বেশি পড়তে হবে। এটা একটা চর্চার বিষয়। এই চর্চাটা একেবারেই নিঃসঙ্গ একটি কাজ। কাজটি করতে হয় নিভৃতে। চর্চার জায়গাটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কীভাবে আসলে আমি চর্চা করব এ বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না। তখন কিছু ছোটগল্প লেখার চেষ্টা করি। সেগুলো বারবার পড়ে লেখার দুর্বলতা খুঁজতাম, ঠিকঠাক করতাম। পাশাপাশি বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ করেও একটা প্র্যাকটিস হচ্ছিল আমার। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সাংবাদিকতা করার যে অভিজ্ঞতা, সেটাও কাজে দিয়েছে। শুরুতেই বলেছি, এটা নিঃসঙ্গ চর্চার বিষয়। এটিকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আসলেই নেই।

আমরা দেখেছি আপনার লেখায় সমসাময়িক রাজনীতি ও এর অন্ধকার দিকগুলো বারবার উঠে আসে। মানে আপনার থ্রিলারের মধ্যে বিষয়গুলো আসে। তার মানে এ বিষয়গুলোও আপনি সচেতনভাবে উপস্থাপন করেন। আপনার লেখার সচেতন পাঠকরাও কিন্তু এ দিকটা নিয়ে আলোচনা করেন। আসলেই কি তাই? আমাদের পাঠকদের উদ্দেশে যদি বিষয়টি তুলে ধরেন।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন : বেশ স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। রাজনীতি আসলে বাতাসের মতোই। সোজা ভাষায়, আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে যাওয়া অক্সিজেনের মতো। কেউ চাক বা না চাক, তাকে এই বাতাস নিতে হয়। কিন্তু যখন বাতাসে অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান জড়ো হতে শুরু করে, তখন তা দূষণ ঘটায়। নির্মল অক্সিজেনটা থাকে না। দূষণ ঘটলে তা সবার জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার এই বিশ্বাসটা সবসময়ই ছিল। বলা যেতে পারে, কলেজজীবন থেকেই। চোখের সামনে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান দেখেছি। ওই সময় তা আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও বটে। রাজনীতি আমার সমাজ ও চারপাশে মিশে আছে।

আমি বিশ্বাস করি, কোনো লেখক যদি তার সত্যিকারের সমাজ এবং চারপাশকে নিয়ে না লেখে, তাহলে সে অসৎ লেখক।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

১ম পৃষ্ঠার পর

যেভাবে সাসপেন্স...

আপনি ‘কীভাবে কেক বানাবেন’—এমন প্রশ্ন করলে তা আসলে একটা ভুল লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দেয়। বরং একজন থ্রিলার লেখকের প্রশ্ন হওয়া উচিত, ‘আমি আমার পাঠকদের কীভাবে ক্ষুধার্ত করে তুলব?’ উত্তরটি সহজ। রাতের খাবারের জন্য তাদের চার ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখুন। খাবার খেয়ে তারা যেন তৃপ্তি পায়, সেজন্য এই অপেক্ষা দিয়ে আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলুন।

একজন থ্রিলার লেখক হিসেবে আমার প্রথম কাজ গল্পের শুরুতে একটি প্রশ্ন উহ্য রাখা কিংবা সরাসরি উত্থাপন করা। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি সচেতনভাবে বিলম্ব করি। আমার এই প্রবন্ধটির শুরুতে পাঠক একটি বিষয় লক্ষ করবেন। আমি কিন্তু আপনার মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছি। এই কৌতূহল জাগিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের পড়তে বাধ্য করেছি। এটা কোনো যাদু নয়। বরং পাঠকের সহজাত মনস্তাত্ত্বিক আবেগের খেলা।

বিনোদন জগতে দীর্ঘ আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, একটিমাত্র বিশেষ উদ্ভাবন এ জগতের ব্যবসার ধরনই আমূল পাল্টে দিয়েছে, সেটি হলো ‘রিমোট কন্ট্রোল’। আশির দশকে এই যন্ত্রের অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে যন্ত্রটি সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছিল। এই যন্ত্র আসার আগে দর্শকরা ভাবত, চাইলেই চ্যানেল বদলানোর সুযোগ নেই। চ্যানেল বদলানোর জন্য দর্শকদের বসার আরাম ছেড়ে টেলিভিশনের কাছে যেতে হতো। টিভির নবটা ঘোরাতে হতো। কিন্তু আলসেমির কারণে তা সম্ভব হতো না বিধায় অনেকে বাধ্য হয়ে একই চ্যানেল দেখত।

কিন্তু যখন রিমোট এলো, দর্শকদের মনোযোগ আমাদের চ্যানেলে আটকে রাখাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। দর্শকরা তখন চাইলে এক নিমেষেই অন্য চ্যানেলে চলে যেতে পারে। সমস্যাটা মোকাবিলার জন্য আমরা মনস্তাত্ত্বিক এক ধরনের কৌশল অবলম্বন করলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির আগমুহূর্তে আমরা দর্শকদের কৌতূহল জাগায় এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিতাম। যেমন বিখ্যাত ‘ডার্টি হ্যারি’ চলচ্চিত্রে হ্যারি কালহান চরিত্রের জন্য নির্মাতারা প্রথমে কাকে পছন্দের তালিকায় রেখেছিলেন? আমরা লক্ষ করলাম, যারা উত্তরটি জানত তারা তো বটেই, যারা জানত না কিংবা যাদের এই বিষয়ে কোনো বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তারাও নিজেদের অনুমানশক্তি পরখ করার লোভে কিংবা নিছক উত্তরটি জানার অদম্য তাড়নায় চ্যানেল পরিবর্তন করত না। তারা বিজ্ঞাপনের লম্বা বিরতির সয়েও আমাদের চ্যানেলের দিকে তাকিয়ে থাকত। মানুষের মস্তিষ্ক এভাবেই কাজ করে; সে অসম্পূর্ণ তথ্য বা অমীমাংসিত প্রশ্ন সহ্য করতে পারে না। আপনাদের কৌতূহল মিটিয়ে দেই, সেই অভিনেতা ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা। এই যে উত্তরটি জানার জন্য আপনারা এতক্ষণ এই লাইনগুলো পড়লেন, এটাই হলো সাসপেন্সের সেই অমোঘ চালিকাশক্তি।

থ্রিলার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি প্রযোজ্য। পাঠক যখন থ্রিলার হাতে নেয়, সে আসলে একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে। গল্পে কেউ খুন হয়েছে। কিন্তু খুন কে করেছে? গল্পে অদ্ভুত কিছু ঘটছে। কেন ঘটছে? কোনো মহাবিপদ ধেয়ে আসছে। থামানো যাবে কীভাবে? যেকোনো বড় রহস্যের সমাধানের আগে লেখক পাঠকদের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের জালে জড়িয়ে রাখেন। এটিকে আমি ‘ড্রিপ ফিড’ পদ্ধতি বলি। পেট ভরে কাউকে না খাইয়ে একটু একটু করে খাওয়ানো।

অনেকে এই পদ্ধতিটিকে অনেক বেশি যান্ত্রিক ভাবতে পারেন। অনেকে এটিকে লেখার সস্তা কৌশলও ভাবতে পারেন। কিন্তু যেকোনো পেশাদার লেখকের জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। থ্রিলারের গল্পে আকর্ষণীয় চরিত্র, চমৎকার বর্ণনাশৈলী কিংবা কাহিনির জটিল বিন্যাস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় অলংকার। কিন্তু মনে রাখবেন, এগুলো এক প্রকার বিলাসিতা মাত্র। গল্পের আসল চালিকাশক্তি হলো চূড়ান্ত উত্তরের দিকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে যাওয়া। আপনি যদি পাঠককে শুরুতেই তৃপ্ত করে ফেলেন তাহলে সে আপনার সাসপেন্সের পথে হাঁটবে না।

লেখালেখি চর্চার দীর্ঘ পথে এটুকু বুঝেছি, থ্রিলার গল্পের সার্থকতা আসলে কতটুকু তথ্য জানালেন তার ওপর নির্ভর করে না; বরং আপনি কতটুকু আড়াল করে অন্তিম উত্তরটি পর্যন্ত পাঠককে নিতে পারছেন তার ওপর নির্ভর করে এর পাঠকপ্রিয়তা। সাসপেন্স কোনো যাদু নয় শুরুতেই বলেছি। আপনি হুট করে সাসপেন্স তৈরি করতে পারবেন না। এটাকে রিলে রেসের মতো দেখতে হবে। রিলে রেসের মতোই নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যাটনটা পাস করে দিতে হবে।

তরুণ এমনকি প্রতিষ্ঠিত থ্রিলার লেখকদের প্রতি আমার সরল পরামর্শ এটিই। আপনারা কেক বানানোর দক্ষ কারিগর হওয়ার চেষ্টা বাদ দিন। উপকরণ দিয়ে গল্পকে ভারী করার মানে হয় না। বরং পাঠকের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করুন। সে যেন ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। তাদের অপেক্ষার প্রহর লম্বা করে দিন। সাসপেন্সের সমাধানের জন্য হাহাকার তৈরি করুন। দেখবেন, ক্ষুধার্ত পাঠক আপনার গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত হাঁটবেন। মনে রাখতে হবে, আকাঙ্ক্ষা দিয়েই কালজয়ী থ্রিলার নির্মাণ হয়।

প্রবন্ধটি ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় ‘আ সিম্পল ওয়ে টু ক্রিয়েট সাসপেন্স’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

ভাষান্তর : অনিক শাহরিয়ার

১ম পৃষ্ঠার পর

এমতাবস্থায় থ্রিলার সাহিত্যের এই ঘাড়ভাঙা গতি বদনামের কারণই বটে। ঠিক সেই কারণেই থ্রিলারের সাহিত্যের ঘাড়ে নানাবিধ বদ তকমা এসে জুটেছে। থ্রিলারকে বুঝতে চাইলে, আমাদের বুঝতে হবে কেন দীর্ঘদিন ধরে আমরা থ্রিলারকে ভুল বুঝে আসছি?

আধুনিক সাহিত্যের এক বজ্রকঠিন শ্রেণিবিন্যাস আছে, বোধ করি উত্তরাধিকারসূত্রেই পাওয়া। এই শ্রেণিবিন্যাসে ধ্রুপদি সাহিত্যের কাজ হচ্ছে মানবজীবনের গভীর অলিগলির সন্ধান করা। আর এসব জনরাভিত্তিক সাহিত্যের কাজ হচ্ছে স্রেফ কাহিনির কাঠামো নিয়ে বোলচাল করা। আর এতেই থ্রিলার আছে বিষম বিপদে, প্রেমের উপন্যাসকে সস্তা আবেগের বাহারি প্রকাশ বলে তকমা দেওয়া আছে; সায়েন্স ফিকশন বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকে নিছক কল্পনা বলে খারিজও করা যায়। থ্রিলারের কাঁধে কিন্তু বেয়াড়া অভিযোগ, এই জনরা মানুষকে বোকা বানিয়ে পেট চালায়। টানটান উত্তেজনা তৈরি করে থ্রিলার আদতে সস্তা দরের হাত সাফাইয়ের খেল দেখাচ্ছে।

এমন চিন্তাধারা আসলে থ্রিলারের সাহিত্য আঙ্গিক চিনতে ভুল করার ফসল। কাঠামোগতভাবে থ্রিলার উত্তেজনা, গতি এবং রহস্য উদঘাটনের ওপর নির্ভরশীল। তবে তার কারণ যদি কেউ ভাবনার দৈন্য হিসেবে দর্শান তাহলে বিস্তর গণ্ডগোল। থ্রিলারে মূলত বহু মত-পথ-পথিকের দেখা হয়, বিষম অবস্থার অবতারণা হয়, সেখান থেকে চলে সংঘাত। এখন সংঘাতটি একটু মশলাদার হয়ে ওঠে বটে, সেই মশলাদার সংঘাতের মাঝেই কিন্তু যাবতীয় দর্শনের সংঘর্ষ দেখানো হয়। আর যেহেতু থ্রিলার আখ্যান পুরোটাই সংঘর্ষকেন্দ্রিক, এই আখ্যান গতিশীলতার দাবি রাখে বৈকি!

এই যে অভিযোগ, সকল থ্রিলার কেমন যেন গৎবাঁধা ছকে চলে, এর পেছনেও কিন্তু এক অমোঘ-গোপন সত্যের আনাগোনা। যেসকল জনরাকে আমরা মাথায় তুলে রাখি, সেগুলোর প্রতিটিরই একটি করে বাঁধা ছক কিন্তু আছে। হোক তা ট্র্যাজেডি, এপিক কিংবা জীবনমুখি উপন্যাস। প্রতিটিরই একটি নিজস্ব ধারা আছে, যা শতাব্দির পর শতাব্দি পরিশীলিত হয়েছে। সমস্যা কিন্তু কাঠামোতে নয়, বরঞ্চ দায়সারা প্রয়োগে। সাহিত্যকে হত্যা করে আলসেমি, কাঠামো বরঞ্চ পথের দিশা দেয়।

থ্রিলারকে এমন বদনজর দেবার কারণ হয়তোবা আরও সরল। থ্রিলার গল্পগুলো ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থাকে। থ্রিলারের পাতায় পাতায় খোলাখুলিভাবে অপরাধের কথা আছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আলাপ আছে, আছে ষড়যন্ত্র, এবং ভীতির আলাপ। ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় এসব বিষয়ে আলাপ যত বিমূর্ত রাখা যায় ততই উত্তম। কিন্তু থ্রিলারের পাতায় এসব বস্তু এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। কারো ওপর নজর রাখা হচ্ছে, কাউকে অসৎ উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হচ্ছে, কেউ হচ্ছে গায়েব। আর পাঠককে পরের পৃষ্ঠা উল্টোতেই হবে। জানতে হবে তো কেন ঘটছে এসব ভীতিপ্রদ ঘটনা?

এসব গল্পকে হাল আমলে থ্রিলার ডাকে, কিন্তু থ্রিলারের বিষয়বস্তু অতিপ্রাচীন। পৌরাণিক গল্প থেকে শুরু করে মহাকাব্যিক আখ্যান—সব ধরনের গল্পেই আখ্যানের মালা গাঁথতে বিপদের হাতছানি, নৈতিক সংকটের সুতো ব্যবহার করা হয়েছে। শত্রু সীমানার গভীর থেকে পালাবার পথ খুঁজছেন ওডিসিয়াস কিংবা সেনাদলের ভেতরে থেকে নিজেরই ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে কেউ। এসব গল্পের গাঁথুনির সাথে এই জামানার থ্রিলারের তফাৎ কোথায়? বদলাচ্ছে কেবল ভয়ের উৎস।

উনিশ শতকে গথিক সাহিত্য মানুষের অস্পষ্ট উদ্বেগকে বাস্তবে নিয়ে আসে। হানাবাড়ি, গোপন অপরাধ, লুকানো রহস্য! সমাজের উদ্বেগ একেবারে পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে পরিণত হয়। শহরের পরিধির সাথে বাড়ে পুলিশি তৎপরতা। পাশাপাশি থ্রিলারের গল্পে যোগ হয় নতুন যুগের উৎকণ্ঠা। অজানা-অচেনা আগন্তুক, শহুরে সংঘাত কিংবা সামাজিক শৃঙ্খলার অতীব ভঙ্গুর অবস্থা। এসবই ছিল গথিক থ্রিলারের কাহিনি।

বিংশ শতাব্দির শেষে এবং একবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে থ্রিলারের খোলনলচে আবার বদলায়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বৈশ্বিক অর্থায়নের রাজনীতি, ডিজিটাল নজরদারি, গোপনে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং ভুয়া তথ্যের রমরমা অবস্থা থ্রিলার গল্পের কাঠোমোতে নতুন মোড় নিয়ে আসে। এবারের শত্রু যে দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। নতুন শত্রুর আবির্ভাব, হয়তো সেটি কোনো একটি দলিল অথবা কোনো অ্যালগরিদম কিংবা এমন বিশাল কোনো কর্পোরেশন, যার সাথে সম্মুখ সমর নৈব চ নৈব চ।

যতবারই থ্রিলারের খোলনলচে বদলাক, একটি ঘটনা নিশ্চিত। সমাজ যখনই নিজেকে অনিরাপদ ভাবা শুরু করে, তখনি থ্রিলার গল্পের তীব্রতা বাড়ে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে থাকা সমাজজীবনে থ্রিলারের গল্পের বেগে ভাটা পড়বে। সামষ্টিক অনিরাপত্তার অনুভূতি যখনই বাড়ে, তখনই থ্রিলারের বাজার চাঙা। এদিক দিয়ে আমরা থ্রিলারকে এক ঐতিহাসিক দলিলও বলতে পারি।

থ্রিলার নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা কিন্তু থ্রিলারের নায়করা এমন এই বিষম পরিস্থিতিতেই তারা দুর্বলের জন্য, ন্যায়ের পক্ষে তাদের লড়াই চালিয়ে যায়। তার জন্য যদি নীতির বাটখারায় সামান্য জালিয়াতি করা প্রয়োজন হয়—তথাস্তু! এমন কাজ আমাদের প্রতিনিয়তই করতে হয়। তবুও বোদ্ধা লোকে বলবেন, থ্রিলারে বাস্তব অনুপস্থিত!

আধুনিক জীবন প্রচণ্ড গতিশীল। এই দ্রুতগতির জীবনে, সাহিত্যেরও তাল মেলানো উচিত। থ্রিলার সাহিত্য আমাদের বেগবান এই জীবনের একেবারে সুযোগ্য সাথি। আমরা তো বর্তমানে থ্রিলার গল্পের প্লটেই বাস করি, এখানে বিপদ আসে আচমকা, নিয়তির অমোঘতায়। আর সমাধান পৌঁছায় গজেন্দ্রগমনে।

থ্রিলার সাহিত্যের জয় হোক!

লেখক : ওয়েস্টার্ন ও থ্রিলার রচয়িতা

থ্রিলারের জন্য...

এই যে অভিযোগ, সকল থ্রিলার কেমন যেন গৎবাঁধা ছকে চলে, এর পেছনেও কিন্তু এক অমোঘ-গোপন সত্যের আনাগোনা। যেসকল জনরাকে আমরা মাথায় তুলে রাখি, সেগুলোর প্রতিটিরই একটি করে বাঁধা ছক কিন্তু আছে

পা ণ্ডু লি পি থে কে

পশ্চিমের রুক্ষ প্রান্তরে অস্তিত্বের লড়াই

ছেলেবেলায় ভীষণ কঠিন সময় পার করেছে পিট। ওর জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিমের রুক্ষ প্রান্তরে। অভাব-অনটন থাকলেও, শরীরের মজবুত গঠনে তার ছাপ পড়েনি কখনও। ওর বাবা-মা মিসৌরি থেকে এসে টেক্সাসের প্যানহ্যান্ডলে, কেনেডিয়ান নদীর অদূরে থিতু হয়েছিল। এক ভয়াবহ বন্যায় ভেসে যায় ওদের সবকিছু, সাথে জীর্ণ একটা আর্মি ওভারকোটে জড়ানো দু'বছরের শিশু পিটও। অর্ধেকটা ভুট্টার খোসায় ছাওয়া একটা কাঠের ওয়াশটাবে ঘুমিয়ে ছিল ও। বন্যার তোড় একটা সাইক্যামোর গাছের নিচু ডালে ছুড়ে দেয় বিছানাটা। পরদিন সাইক্যামোরের ডালে আটকে থাকা ওয়াশটাবটা আবিষ্কার করে কৌতূহলভরে এগিয়ে যায় সার্চ পার্টির সদস্যরা। একদম অক্ষত অবস্থায় সোজাভাবে ঝুলছিল ওটা। ওই ওয়াশটাবের ভেতরে নিরুৎসুক দৃষ্টিতে, নিরানন্দ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল দু'বছর বয়সি পিট, আর নিজের একটা বুড়ো আঙুল চুষছিল।

'খোদা, বেঁচে আছে ছেলেটা!' চেঁচিয়ে উঠল সার্চ পার্টির একজন।

দারিদ্র্যের জন্য প্যানহ্যান্ডলের র‍্যাঞ্চারদের কুখ্যাতি থাকলেও, উৎপাদনে তারা ছিল অতিশয় পটু। সার্চ পার্টির প্রত্যেকেই ওই আবিষ্কারের মতোই একটা-দুটো নতুন ধারণার জন্ম দিল। তাদের মধ্যে কে মিসৌরির পরিবারটার একমাত্র জীবিত বংশধরের ভরণপোষণ করবে তা ঠিক করতে লটারি করা হলো। প্রথম আবিষ্কারকের কপালেই জুটল দায়িত্বটা। ওয়াশটাবটা নিশ্চয় মহামূল্য কিছু হবে এই ভেবে নিজেকে সান্তনা দিল সে।

পিটের বয়স যখন বারো বছর, রীতিমত একজন মরদের কাজ করছে সে—যদি তার উদ্ধারকর্তাকে আদৌ একজন মরদ বলা যায়। এক চৌঠা জুলাই আকণ্ঠ ভুট্টার মদ গিলে বাড়ি ফেরে ওর পালক-পিতা। তার সামনে পড়ে যায় পিট, আর লোকটা লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় ওকে। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়ায় পিট। হয়তো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে পালাত সে, যদি না ওর বোন—প্যাকাটির মতো শরীর, একজোড়া মরাটে নীল চোখ আর একচিলতে ঝুঁটি—মুঠি পাকিয়ে উড়ে যেত ওর বাবার দিকে। বোনটা ভীষণ স্নেহ করত পিটকে। ওকে চড় কষাল র‍্যাঞ্চার, এত জোরে যে মাটিতে পড়ে গেল মেয়েটা। বোনকে উঠে ছুটে পালাতে না দেখে পিট ধরে নিল নিশ্চয় মারা গেছে ও। দপ্ করে প্রতিহিংসার বারুদ জ্বলে উঠল ওর মাথায়।

ছোঁ মেরে হোলস্টার থেকে বের করে নিল পালক-পিতার পিস্তলটা, ঠেঁসে ধরল নরম কিছু একটায়। ও ইচ্ছেকৃতভাবে পিস্তল কক্ করে ট্রিগার টিপেছিল কি না সেই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। চাপা একটা বিস্ফোরণের পর দেখা গেল, কর্ন হুইস্কির পাত্র হিশেবে সম্পূর্ণ অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছে পিটের পালক-পিতা। পিট ঠিক প্রতিবাদী ছিল না, তবে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল।

সিক্স-শ্যুটারটা নিজের কাছে রেখে দিল ও, র‍্যাঞ্চারের ঘাম-সপ্‌সপে পনিতে চড়ে বসল। এছাড়া ওই মুহূর্তে আর কী করার আছে তার জানা ছিল না। সারা রাত ঘোড়া হাঁকিয়ে ভোরের দিকে কেনেডিয়ান নদীর বহু মাইল উত্তরে হঠাৎ করেই একটা ক্যাম্পের দেখা পেল সে, ধরে নিল কাউ ক্যাম্পজাতীয় কিছু হবে হয়তো। প্রথমে খাওয়ানো হলো ওকে, তারপর শুরু হলো জেরা। জবাবে পিট বলল বাবার সাথে বনিবনা না হওয়ায় বাড়ি থেকে পালিয়েছে সে এবং আর সেখানে ফিরে যাচ্ছে না। ওর সারল্যে আমোদ পেল দলটা। কী করতে চায় সে, জিজ্ঞেস করা হলে, পিট জানাল ওই দলের সাথেই সে থাকতে চায়, কেননা ওদেরকে তার ভালো মনে হয়েছে।

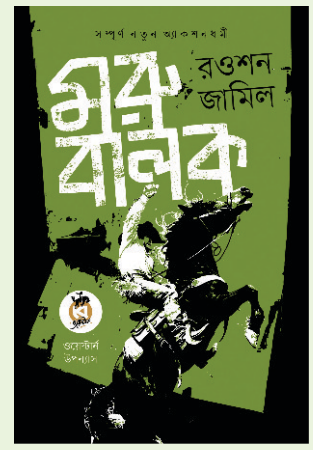

মরুবালক
রওশন জামিল

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
ধরন : ওয়েস্টার্ন উপন্যাস
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস

প্রবন্ধ

পাঠকমনে থ্রিলারের প্রভাব

আমিরুল আবেদিন

থ্রিলারের নায়ক প্রাচীনকালের মহাকাব্যের নায়কের মতোই। কী চমৎকারভাবে বন্দুক চালাচ্ছেন নায়ক! এই নায়ক দারুণ রোমান্টিক। এই নায়ক মানুষের সঙ্গে দারুণভাবে মিশতে পারে। একজন সাধারণ মানুষ যে অতিমানবীয় হতে পারে না, সেই তীব্র মানসিক আকাঙ্ক্ষা থ্রিলার পড়ে অনেক পাঠক উপলব্ধি করেন। এই মানসিক তৃপ্তিটুকু পাঠককে বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা থেকে পালাতে সাহায্য করে। একইসঙ্গে থ্রিলার আধুনিক প্রযুক্তি, রাজনৈতিক সংকট, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এমনকি মানসিক টানাপোড়েন সম্পর্কেও অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণা দেয়। ফলে পাঠকরা থ্রিলার পড়ে অনেক কিছু জানতে পারেন। সেটা একাডেমিয়ার বইয়ের মতো খটমট না বলে যেকোনো বয়সের বা শ্রেণির মানুষ পড়তে পারেন।

থ্রিলারের সাব-জনরাকে ক্রাইম, সাসপেন্স, ফ্যান্টাসি, স্পাই, অ্যাকশন, সাইকোলজিক্যাল ইত্যাদি যে ভাগেই ভাগ করা হোক না কেন, থ্রিলার সবসময়ই অপরাধ জগতকে আবিষ্কার করতে চায়। এই অপরাধ জগতে চাকু হাতে কোনো সিরিয়াল কিলার ছুটে বেড়াচ্ছে, অবিরাম। অথবা কোনো অপতৎপরতাকারী ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। কোথাও একজন মাস্টারমাইন্ড পেছন থেকে অপরাধের কলকাঠি নাড়ছেন। সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখি অপরাধী একজন ভিক্টিমকে তার নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দিচ্ছে। এই ইচ্ছে চাপিয়ে দিয়েই তারা একের পর এক অপরাধ করতে থাকে। একজন সিরিয়াল কিলার প্রতিবার একটি করে খুন করে। একজন দুর্বৃত্ত কোথাও বোমা বিস্ফোরণে ডজনখানেক মানুষকে মেরে ফেলতে চায়। থ্রিলারের অপরাধ যেমনই হোক না, ঘটনাপ্রবাহে ওই মারপিট, বিশৃঙ্খলা এবং মৃত্যুই ঘুরেফিরে আসে। আর অপরাধীরা কীভাবে এই অপরাধ করে, থ্রিলারের প্লট সেটিকেই তুলে ধরে।

থ্রিলারে পাঠকরা মানসিকভাবে একটি চমৎকার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। এই জনরার সাহিত্যে দেখা যায়, একজন নায়ক যখনই কোনো অপরাধীকে পরাজিত করেন তখন তিনি আমাদের ভেতরকার সবচেয়ে নোংরা দিকটিকেও ভেঙেচুরে ফেলেন। সেটি তার নৈতিক আদর্শিক জায়গার মাধ্যমে। বিষয়টা যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত থ্রিলার লেখক ডেডিভ বালডাসি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মানুষ যখন চাপে থাকে তখন তার চিন্তার ভারসাম্যে ছন্দপতন ঘটে। মানুষ ভাবে, মন্দ কিছু সবসময় ভালোকে পরাজিত করে। এই ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে দেয় থ্রিলার। থ্রিলারে মন্দকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হয় যে পাঠকের মনস্তত্ত্বে নাড়া পড়ে। তারা দেখে, মন্দকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই মন্দের রহস্যটুকু উন্মোচিত হয়ে যায় বলে পাঠক আনন্দ পায়। আধুনিক নগরজীবনে মানুষের মনে বিভিন্ন চাপ থাকে। কেউ হয়তো আর্থিক মন্দায় ভুগছেন, কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, আবার কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত। সব মন্দই তাই মানুষের কাছে এক ধরনের ধাঁধা ও রহস্য। এই রহস্য মস্তিষ্কে অস্বস্তি বাড়ায়। থ্রিলার অনেক সময় অযৌক্তিক ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমেও ধাঁধার জবাব দিয়ে যায়। থ্রিলারের পাঠকদের কাছে তাই ঘটনায় টুইস্ট, রোমাঞ্চ—এ শব্দগুলোই বারবার শুনতে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্বের ভাষায় এই মানসিক কৌতূহলকে বলা হয় 'ম্যাকাব্রে ফ্যাসিনেশন।' এই কৌতূহল সাধারণভাবে ভয়ংকর এবং বিদ্বেষপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থেকে জাগে। রক্তপাত, সহিংসতা, ভয়াবহতা এবং হত্যার প্রতি অবচেতনে এই আগ্রহ এক ধরনের মুগ্ধতা জাগায়। তবে পাঠকরা থ্রিলারের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকতে চায় না। কিন্তু ওই বিপদের যন্ত্রণা ও ভয়টা অনুভব করতে চায়। থ্রিলার মানসিকভাবে এই ইচ্ছাকে পূরণ করে। সম্ভবত এটি একটি কারণ, যার জন্য থ্রিলার অনেক জনপ্রিয়। আর কৌতূহলটিকে অ্যাকশনের মাধ্যমে পূরণ করেন থ্রিলারের নায়ক।

থ্রিলার পড়ে পাঠক ধাঁধার সমাধান করতে না পেরে বোকা বনে যেতে পারেন। তবে থ্রিলার পড়ে কেউ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে চান না। যুক্তরাষ্ট্রের লেখক রেমন্ড শ্যান্ডলারের একটি উক্তিই আসলে এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়। উনি বলেছিলেন, 'একটি ভালো থ্রিলার পাঠককে হতবুদ্ধি করুক তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু সেটি যেন কোনোভাবেই পাঠকের সঙ্গে সততার জায়গা থেকে বিচ্যুত না হয়।'

লেখক : অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাহলে বিষয়টি সত্যিই বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। এর বড় কারণ, ওই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি আর গবেষণার ঘাটতির বিষয়টি। চাইলেই কেউ থ্রিলার উপন্যাস লিখে ফেলতে পারবেন না। ন্যূনতম প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে।

ভালো থ্রিলার লেখকরা নিজেরাও প্রচুর থ্রিলার পড়েন। তারপর আসে প্লট। আর এর সাথে যোগ হয় দরকারি তথ্য। এখনকার লেখকদের মধ্যে ওই প্রচেষ্টাটুকু দেখানোর আগ্রহ নেই। তাদের অনেকের প্রত্যাশা থাকে যে, কোনোভাবে কয়েকটা লেখা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অল্পবিস্তর সাড়া ফেললেই হলো। কিছু প্রকাশনী মুখিয়ে থাকে সেটাকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা পসার করে নেয়ার জন্য। তাদের এই মেলবন্ধনটাই এখন বাজারে চলছে। এটাকে আমি এক ধরনের শর্টকাট রুট বলে মনে করি। বাংলাদেশিরা অবশ্য শর্টকাট খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। নিজের সাময়িক ফায়দার জন্য একটা গোটা সেক্টরের ক্ষতিসাধন করতে আমাদের হাত কাঁপে না। আর মৌলিক থ্রিলার কম রচিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের থ্রিলার পাঠকসমাজের উন্নাসিকতা।

বাংলা ভাষায় বিশেষত বাংলাদেশে মৌলিক থ্রিলার সাহিত্য রচনার শুরুটা অনেক আগে হলেও, সংখ্যাগত দিক দিয়ে এখনও তা অতটা ভারী হয়ে ওঠেনি। অধিকাংশ থ্রিলার পাঠকের এ জনরা পড়ার হাতেখড়ি হয় ইংরেজি মৌলিক উপন্যাস অথবা সেগুলোর অনুবাদ পড়ার মধ্য দিয়ে। বিদেশ থেকে আসায় কাহিনির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের ব্যাপারটা প্রকট। বিদেশি থ্রিলার মুভি দেখার ফলে আমরা তাদের কাহিনিগুলো পড়ে মনে মনেই দৃশ্যগুলো অনায়াসে সাজিয়ে নিতে পারি। দেশীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সেরকম কিছু আমাদের এখনও দিতে পারেনি। সেক্ষেত্রে মৌলিক বাংলা থ্রিলার প্লটগুলো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তবিক মনে হবার একটা সম্ভাবনা রয়েই যায়। বিদেশি মৌলিক থ্রিলার বা অনুবাদ পড়ে জন্ম নেয়া উন্নাসিকতার সামনে তখন দেশীয় মৌলিক থ্রিলার প্লটগুলো অসহায় হয়ে পড়ে। এজন্য ভিজ্যুয়ালাইজেশন একটা অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়।

থ্রিলার ও রিয়ালিজম

থ্রিলারের ক্ষেত্রে এখনও আমরা অনেকটা বইনির্ভর। যদিও ফিল্ম বা ওয়েব সিরিজের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। সেটার একটা ব্যাখ্যাও দেয়ার চেষ্টা করেছি। থ্রিলার সাহিত্যের পরিচর্যার দায়িত্ব এখনও প্রকাশনীর। আনন্দের বিষয় যে, এ সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে স্রোতের বিপরীতে অনেকেই সাঁতার কেটে চলেছেন এখনও। সেসব লেখক ও প্রকাশকদের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা সবসময় থাকবে।

দেশে থ্রিলার সাহিত্যের বিকাশের সংকট নিয়ে কথা বলতে গেলে শেষ হবে না। এখন যেকোনো ধরনের জনরারই একনিষ্ঠ পাঠক কমে গিয়েছে। ৭০, ৮০ ও ৯০'র দশকে সিনেমা ও সাহিত্যে সমানতালে রুক্ষতা সহকারে শৌর্য প্রদর্শনী, খুন-খারাপি, হত্যাযজ্ঞ বিষয়ক চিত্রায়ন ও বর্ণনাগুলো উঠে আসত। আর পাঠকসমাজে সেগুলো সমাদৃত হতো। কারণ, এগুলো থ্রিলার সাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া, মাস মিডিয়া, চলচ্চিত্রমাধ্যম যে শুদ্ধিকরণের মধ্য দিয়ে এখন যাচ্ছে, সেখানে এসব উপাদানের ঠাঁই হচ্ছে না আর। এভাবে থ্রিলার সাহিত্যের সৌন্দর্য কেড়ে নিলে সেটা নিরামিষই লাগবে বৈকি। নতুনধারার পাঠক তাদের ডোপামিন আর এড্রেনালিন রাশ খুঁজে নিচ্ছে এখন ভিন্নধারার সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে। তাদের ভাবনার বুনন গড়ে উঠছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবেই। এমনিতে পাঠকসংখ্যা কমছে। অডিও বুক, ই-বুক, পডকাস্টের আগ্রাসন চলছে। তার সাথে এই ভিন্নধারার সাহিত্যের জোয়ারে নতুন হার্ডকোর থ্রিলার পাঠক তৈরি হওয়া তো দূরের কথা, টিকে থাকাই মুশকিল। দেশীয় মৌলিক থ্রিলারের মেইনস্ট্রিম এক্সপোজার এখন তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, পাঠক সমাজের অতিরিক্ত মাত্রায় উন্নাসিকতা কমাতে হবে। দেশীয় মৌলিক থ্রিলার লেখকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা প্রচুর প্রতিভাবান হওয়ার পরও এসব কারণে লেখালেখি থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছেন। শব্দটা ব্যবহার করতে চাইনি, তবে বাধ্য হচ্ছি। এরকম লেখক-লেখিকাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নতুন মৌলিক থ্রিলার সাহিত্য রচিত হওয়ার কোনও বিকল্প এ মুহূর্তে দেখছি না। তৃতীয়ত, লেখকদের এক ধরনের মানসিকতা ইদানিং একেবারে চোখ এড়ায় না, সেটা হলো ডিলিউশন অফ গ্র্যান্ডিওর বা মহত্ত্বের বিভ্রম। একটা বই লিখলেই সেটা মাস্টারপিস, বেস্টসেলার হয়ে যাবে না, সেটা মাথায় রাখতে হবে। প্রচেষ্টার সাথে আনুপাতিক হারে প্রত্যাশা রাখতে হবে, তার চেয়ে বেশি নয়। যুক্তিসিদ্ধ উৎস থেকে পাওয়া আলোচনা ও সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতাও থাকা উচিত।

লেখক : বুক ইনফ্লুয়েন্সার

বেঙ্গলবুকস প্রকাশিত কয়েকটি অনুবাদ বই

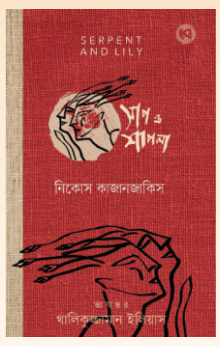

সাপ ও শাপলা
নিকোস কাজানজাকিস
ভাষান্তর : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস
মূল্য : ৩৯৪৳

ডিজারশন
পলায়ন
মূল : আবদুলরাজাক গুরনাহ
ভাষান্তর : আলী আহমদ
মূল্য : ৬৬০৳

অতলান্তিকের এপার ওপার
ভাষান্তর : ফারুক মঈনউদ্দীন
মূল্য : ৪৯৬৳

সিদ্ধার্থ
মূল : হেরমান হেসে
ভাষান্তর : শীলভদ্র
মূল্য : ৩৯২৳

মান্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প
ভাষান্তর : কমলেশ সেন
মূল্য : ৩৮০৳

হিউম্যান অ্যাক্টস
মূল : হান কাং
ভাষান্তর : আমিরুল আবেদিন
মূল্য : ৩৯৪৳

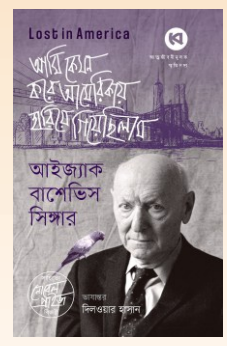

লস্ট ইন আমেরিকা
আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার
ভাষান্তর : দিলওয়ার হাসান
মূল্য : ৪৫০৳

ক্রনিকলস
বব ডিলান
ভাষান্তর : শওকত হোসেন
মূল্য : ৪৯৬৳

+8801958519882, +8801958519883 /bengalbooks.com.bd www.bengalbooks.com.bd

স্টল নম্বর : ৬১৭—৬২১

থ্রিলার গল্প

তদন্তে ভুল ছিল

অরুণ কুমার বিশ্বাস

আবিরের ছোটমামা থানার বড় দারোগা। সপ্তায় একবার অন্তত তিনি ভাগনেদের সাথে জমিয়ে আড্ডা মারেন। আড্ডায় নাকি মাথা খোলে। চোর-ছেঁচড় ধরতে সুবিধা হয়।

একদিন কথায় কথায় মামা বললেন, বুঝলে ভাগনেরা, পুলিশের চাকরিতে আর আগের মতোন সুখ নাই।

কেন, কেন মামা! কথায় বলে মাছের রাজা ইলিশ, চাকরির রাজা পুলিশ! সুখ নেই কেন? পাকনা পোলার মতো বলল আবির।

না না, মানে চোর-ডাকাতরা আর আগের মতো কাজকাম করতে পারছে না। যাও বা টুকটাক কিছু করে, তাতে মগজের খেলা নেই। তাই ওদের পিছু ধাওয়া করে আগের মতো আমেজ আসে না।

মামার কথায় সায় দিয়ে ওরা সব দম দেয়া পুতুলের মতো মাথা নাড়লো। ঠিক তক্ষুনি হন্তদন্ত হয়ে ছোটমামার চেম্বারে ঢুকলো থানার মেজদারোগা নরেশ।

কী হে নরেশ, খুনের কিনারা হলো? স্পটে গিয়ে তুমি কী দেখলে সব খুলে বলো। তবেই খুনি কে সেটা আন্দাজ করতে পারবো।

নরেশ ঠক্ করে একখানা স্যালুট ঠুকে যা যা দেখেছে তার বয়ান দিতে লাগলো। স্যার, গোড়া থেকে বলি—গিয়ে দেখি স্যার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, তবে জানালার কাচ ভাঙা। মুরগির খোপের মতো ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে অনায়াসে কেউ ঢুকে যেতে পারে। বাসার সামনে একচিলতে বাগান। সেখানে সবজির চাষ করা হয়েছে।

নাও এবার আসল কথা বলো, খুন কীভাবে হল। মাথা নাড়লেন ছোটমামা।

নরেশ আবার শুরু করে—রসুইঘরে নল দিয়ে ছ্যার ছ্যার করে পানি পড়ছিল। কাঁচা ডিমের গন্ধ। পেঁয়াজের খোসা। কেমন যেন ওমলেট ওমলেট ভাব। চুলোয় হাত দিয়ে দেখি বেশ গরম। খুনটা করে খুনি নিশ্চিন্তে নুডল্স বানিয়ে খেয়েছে। চীনে ভাষায় চাওমিন। কফিও খেয়েছে সে। তার মানে খুনি অচেনা কেউ নয়। ভিকটিমের কাছের কেউ হবে।

মামা তেরছা হেসে বললেন, বাহ্ বাহ্! তোমার মাথায় তো মেলা বুদ্ধি নরেশ। অমনি তুমি ধরে নিলে যে নুডলস খুনিই খেয়েছে! কেন, যে বেটা খুন হলো সে কি খেতে পারে না?

নরেশ লোকটা আদতে আলাভোলা। মামার কথার খোঁচাটা সে ধরতে পারে না।

ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলল, তা অবশ্য পারে। তবে কি স্যার, মরার আগে তো কেউ নুডল্স খায় না। ভালমন্দ কিছু খায়।

রেগে যান ছোটমামা। বাজখাঁই গলায় বললেন, কাজের কথা কও। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি খুনের তদন্ত করতে গেছ!

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

থতমত খায় দারোগা নরেশ। মিনমিনে সুরে বলে, লাশ খাটের নিচে অর্ধেক, আর বিছানায় ছিল অর্ধেক। এমনভাবে উপুড় হয়ে পড়েছিল যেন সে সন্ধ্যা নদীতে সাঁতার কাটছে।

কী নদী বললে?

সন্ধ্যা নদী।

তোমার বাড়ি বরিশাল, তাই না নরেশ?

জি স্যার।

লোকটা কী করে মারা গেল কিছু অনুমান করতে পারছ নরেশ? গুলি-টুলি?

না স্যার, গায়েপিঠে কোথাও গুলির চিহ্ন নেই, তবে কাটা দাগ ছিল। গলায়। তাকে ক্ষুর চালিয়ে খুন করা হয়েছে। যদ্দুর মনে হয় স্পট ডেড। মানে বেচারা ভিকটিম ক্যাঁ করারও সুযোগ পাননি। ক্ষুরের এক টানে খালাস!

কথাটা বলেই নরেশ হাতের ইশারায় নিজের গলায় ক্ষুরের টান টেনে দেখাল। মানে সে অভিনয়ে পাকা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেশ বেশ! ওটা যে ক্ষুরের পোচ কী করে বুঝলে হে নরেশ? তুমি তো সামনে ছিলে না।

না মানে স্যার, এত সূক্ষ্ম কাটাদাগ, খুব ধারালো কিছু হলেই তা সম্ভব। ক্ষুর না হোক, ব্লেড হবে। বিদেশি জিলেট।

নরেশ বেশ জোরের সাথে বলল—তারপর শুনুন স্যার, তার পরনে ছিল লুঙ্গি, উদোম গা। খুব গরম তো, তাই হয়তো শার্ট খুলে রেখেছিল। সে এক কেলেংকারি কাণ্ড। তার লুঙ্গিটাও কোমর অব্দি উঠে গিয়েছিল। কী লজ্জার কথা বলুন!

দারোগার কথা শুনে মুচকি হাসেন ছোটমামা। আবির হো হো করে হাসে। ওর দেখাদেখি অন্যরাও।

বুঝলেন স্যার, তিনি অতি সজ্জন মানুষ। খুব বই পড়তেন। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বই পড়া যায়। তিনিও পড়ছিলেন—কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস। গোয়েন্দা গল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বোঝা যায়।

কী নাম বললে? কার বই পড়ছিলেন?

বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস। ওই যে ট্রেনিং-এর সময় আপনারা আমাদের যা পড়িয়েছেন। খুব বড় গোয়েন্দা।

ছোটমামা এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন। ডিটেকটিভ শার্লক হোমস!

নরেশ, এবার একটু ডিটেলে বলো তিনি ঠিক কোন গল্পটা পড়ছিলেন? কত দূর অব্দি?

কী যেন ভাবছে নরেশ। মাথা চুলকায়। তারপর বলে, জি স্যার, মনে পড়েছে। 'দ্য সাইন অফ ফোর'।

কত দূর অব্দি পড়েছিলেন মনে আছে নরেশ? ফের জানতে চান আবিরের ছোটমামা।

অনেকখানি পড়েছিলেন স্যার। তালপাতার পাখার মতোন মাথা নেড়ে নরেশ বলল। বইয়ের ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা খোলা ছিল। কয়েকটা জায়গায় লাল দাগ। লাইনের নিচে দাগ কেটে রেখেছেন।

ঠিক বলছো তো নরেশ! তোমার স্মরণশক্তি এত প্রখর! ভুরু নাচিয়ে বললেন ছোটমামা!

জি স্যার। আমার ঠিক মনে আছে, সাইন অফ ফোর, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৩-৩৪।

আবির ও তার বন্ধুরা মামাকে দেখছে। মামা খরচোখে নরেশের দিকে তাকিয়ে আছেন। আবির বুঝতে পারে মামা রেগে যাচ্ছেন। নরেশের চাকরি নট। কিন্তু ওরা বুঝতে পারে না, নরেশ ভুলটা আসলে কী বলল!

তুমি একটা ফোর-টুয়েন্টি মানে চারশো বিশ। মোটেও তুমি স্পটে যাওনি। কারো মুখ থেকে শুনে খুনের রিপোর্ট করেছ! বাকিটা স্রেফ গালগপ্পো। শার্লক হোমস আমিও পড়ি নরেশ।

জি স্যার! কেন স্যার? আমি সেখানে গিয়েছি।

ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খায় থানার অতিচালাক দারোগা। ঘন ঘন ঢোক গেলে। দাঁতে নখ খুঁটে। মানে সে ভয় পেয়েছে। আর মানুষ তখনই ভয় পায়, যখন সে কোনো অপরাধ করে ফেলে।

ফের মিথ্যে কথা! মোটেও তুমি সেখানে যাওনি। পুরোটাই ধাপ্পা। মামা আবারও ধমক দেন।

তারপর মামা বললেন, তুমি একটা বোকামি করে ফেলেছ। তুমি পাকা মিথ্যুক নরেশ। ভেবেছো পুলিশে চাকরি করি বলে বইটই পড়ি না। দুনিয়ার কোনো বইয়ে বিজোড় আর জোড় পৃষ্ঠা পাশাপাশি থাকে না, থাকে জোড়-বিজোড়। ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা বললে ঠিক ছিল। তুমি সেখানে যাওনি তাই কেসটা বিশ্বাসযোগ্য করতে ভুল মেরে দিয়েছ। তোমার গোড়ায় গলদ।

মামার কথা শুনে আবির অবাক। অমনি হাতের কিশোর পত্রিকা খুলে দেখে ঠিক তাই। পাশাপাশি জোড়-বিজোড় পৃষ্ঠা থাকে। আর বিজোড়-জোড় হয় কেবল পাতার এপিঠ-ওপিঠ। নরেশ মিথ্যে বলেছিল যে বইয়ের ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা খোলা দেখেছে । একটা ছোট্ট মিথ্যার কারণে ফেঁসে গেল নরেশ।

সে যে ঠিকঠাক তদন্ত করেনি তা ধরা পড়ে গেল।

কিন্ডারবুকস প্রকাশিত কয়েকটি শিশুতোষ গল্প

স্টল নম্বর ৮১, ৮২, ৮৩

ছোট্ট ইঁদুর দেখবে সাগর
আসাদ চৌধুরী
মূল্য : ১৪০৳

আ-কার যাচ্ছে মায়ের কাছে
দন্ত্যস রওশন
মূল্য : ১২০৳

এ-কার থাকে সবার পাশে
দন্ত্যস রওশন
মূল্য : ১২০৳

রুশার খাতায় ফুলের গন্ধ
মাসউদ আহমাদ
মূল্য : ১৪০৳

পিংকি ও জীবনানন্দ কাকু
মাসউদ আহমাদ
মূল্য : ২৬০৳

ভূত প্রাসাদ
আরহাম গল্প
মূল্য : ২০০৳

ইচ্ছেপূরণ
জাফ্রিনা তুশিন
মূল্য : ২০০৳

/kinderbooksBD www.kinderbooks.com.bd বই পেতে কল করুন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮১, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাজী আনোয়ার হোসেন সত্যিকারের পরিণত পাঠকের উপযোগী রোমাঞ্চোপন্যাস রচনার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর বাস্তবায়নের মাঝে ছিল দুস্তর ব্যবধান। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আরো কিছু বিদেশি থ্রিলার পড়েন তিনি। এরপর লেখার ধরন নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছিল তাঁকে। প্রচল ভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে পাঠকের সাথে সরাসরি কথোপকথনের ঢঙ বেছে নেন তিনি। শুরু হয় বাংলাদেশের শুধু নয়, বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ স্পাই থ্রিলারের এক অবিস্মরণীয় পর্ব। মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই *ধ্বংস পাহাড়* রচনায় হাত দেন তিনি। খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালের জুন মাসে *ধ্বংস পাহাড়* বের হলে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বইটির অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী অঙ্গসজ্জা, লেখনশৈলী, উপস্থাপনা সবার দৃষ্টি কাড়ে। অবশ্য কেউ কেউ যথারীতি নিন্দার ঝড়ও তোলেন। অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে—যেটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু কাজী আনোয়ার হোসেন পরোয়া না করে লিখে গেছেন একের পর এক সিরিজের আরও বই। মাসুদ রানার অপ্রত্যাশিত চাহিদার দরুন দ্রুত লেখালেখির স্বার্থে সিরিজের তৃতীয় বই *স্বর্ণমৃগ* থেকেই বিদেশি রোমাঞ্চোপন্যাসের শরণ নিতে শুরু করেন তিনি। সিরিজটির অব্যাহত প্রকাশনা একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। ইয়ান ফ্লেমিং, অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলীন, ডেসমন্ড ব্যাগলি, জেফরি জেনকিনস্, কেন্ ফলেট, জেমস হেডলি চেজ, উইলবার স্মিথ, ক্লাইভ কাসলার, জ্যাক ডু ব্রুল, ড্যান ব্রাউন, স্কট মারিয়ানিসহ অসংখ্য বিদেশি লেখকের কাহিনি অবলীলায় মাসুদ রানায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজী আনোয়ার হোসেনের অনন্য অ্যাডাপ্টেশনের গুণে প্রতিটি কাহিনি নতুন বৈচিত্র্যময় রূপে ধরা দিয়েছে পাঠকের কাছে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি তখনও। প্রকাশনা সংক্রান্ত অপরাপর দিকগুলোরও দেখাশোনা করতে হতো বলে তাঁর পক্ষে দুকূল সামলানো দায় হয়ে ওঠে; তাই অশ্রুতপূর্ব একটি কৌশলের আশ্রয় নেন তিনি : সিন্ডিকেটেড রচনা বা গোস্ট রাইটারের লেখা বই প্রকাশ। ফলে শেখ আব্দুল হাকিম, হাসান উৎপল (অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী), ইউসুফ ফারুকদের (সাংবাদিক খন্দকার আলী আশরাফ) মতো লেখকরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাসুদ রানা ও সেবার অন্যান্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেন যেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজী আনোয়ার হোসেনের নামে প্রকাশিত হতে থাকে। কাজী আনোয়ার হোসেনের মৃত্যু আবধি এই ধারা অব্যাহত ছিলো।

গত শতকের ৬০'র দশকে মাসুদ রানা সিরিজের পাঠকপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো কিছু লেখক মাসুদ রানার আদলে বিভিন্ন নামে সিরিজ লিখতে শুরু করেন। তবে এগুলোর কোনোটাই শেষতক টেকসই হয়নি। সম্ভবত লেখকদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গির অভাব ও কাহিনি নির্বাচনে ব্যর্থতা এর কারণ হয়ে থাকবে। এসব সিরিজের ভেতর জাকি আজাদ (লেখক : শেখ আব্দুল হাকিম), আহমেদ রুশদী, সেলিম রেজা ইত্যাদি উল্লেখ করার মতো।

সেবা প্রকাশনী থেকে বেরিয়ে আসার পর শেখ আব্দুল হাকিম 'জাকি আজাদ' সিরিজকে আবার চাঙা করার চেষ্টা করলেও সফল হননি। প্রথমাসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনী থেকে তাঁর এই সিরিজের বই বের হয়েছে।

আশির দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশে পেপারব্যাক প্রকাশনার এক ধরনের হুজুগ দেখা দিয়েছিল। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন প্রকাশনী পেপারব্যাক ফর্মে রোমাঞ্চোপন্যাস প্রকাশ করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রকাশনীর নাম পর্যন্ত সেবার আদলে ছিল। অবশ্য অল্প দিন পরেই এরা গুটিয়ে যায়।

কাজী আনোয়ার হোসেনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর হাত ধরেই বলা যায় বাংলাদেশে রহস্যরোমাঞ্চ ধারার সাহিত্যের একটা সুবাতাস বইছে। মাসুদ রানা সিরিজের অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় চরিত্র মেজর জেনারেল রাহাত খান। সিরিজের পাঠকরা রানার মতো এই গুরুগম্ভীর জেনারেলকেও সমান ভালোবাসেন। ইফতেখার আমীন মেজর জেনারেল রাজাত খানের চরিত্রকে নিয়ে তাঁর মহাযুদ্ধকালীন

বাংলাদেশের সাহিত্যে...

> পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের আধিপত্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মূলধারার সাহিত্যের অতিক্ষুদ্র সহযাত্রী হয়ে রহস্যরোমাঞ্চ সাহিত্যও হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে এগিয়ে চলছিল, যদিও সাহিত্যের গুণ বিচারে সেসব খুব একটা উন্নত ছিলো এমন দাবি সম্ভবত করা সমীচীন হবে না

তৎপরতাভিত্তিক 'মেজর রাহাত' নামে একটি উপসিরিজ শুরু করলেও বেশ কয়েকটি বই বের হওয়ার পর অজ্ঞাত কারণে থেমে গেছেন।

বাংলাদেশের রোমাঞ্চসাহিত্যের আরেক দিকপাল হুমায়ূন আহমেদ। বাংলাদেশের মূলধারার সাহিত্যকে ঈর্ষণীয় রচনা কৌশলে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তা অভূতপূর্ব। তাঁর মতো বহুলপ্রজ লেখক নানা ধারার লেখা লিখবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁর কিছু কিছু উপন্যাসকে অসাধারণ রোমাঞ্চোপন্যাস হিসেবে অনায়াসে অভিহিত করা চলে। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে রচিত তাঁর *অমানুষ* ও *সম্রাট* নিখাদ থ্রিলার। তাছাড়া, মিসির আলী সিরিজেও থ্রিলার ঘরানার কাহিনি আছে।

গত কয়েক দশকে সেবা প্রকাশনী থেকে মাসুদ রানার বাইরেও অসংখ্য রোমাঞ্চোপন্যাস প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। শেখ আব্দুল হাকিম, হাসান উৎপল, রকিব হাসান, রওশন জামিল, নিয়াজ মোর্শেদ, বিশু চৌধুরী, হিফজুর রহমান, রোকসানা নাজনীন, অনীশ দাস অপু, ইফতেখার আমীন একক বা কাজী আনোয়ার হোসেনের সাথে যৌথভাবে (*স্যাবটাজ*, *দাগী আসামী*) বেশ কিছু থ্রিলার রচনা করেছেন। অনীশ দাস অপু অতিলৌকিক কাহিনি উপস্থাপনের জন্য জনপ্রিয়। সেবা প্রকাশনী থেকে এক সময় হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবালের বই প্রকাশিত হয়েছে। সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্র হীরক চৌধুরী *প্রতিহিংসা* নামে মাসুদ রানা সিরিজের একটি বই লিখে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর *ব্ল্যাকমেইল*ও বেশ কদর পেয়েছে। অ্যান্টিহিরো জাকিকে নিয়ে সেলিম হোসেন টিপু মাত্র তিনটি বই লিখে পাঠকমহলে বেশ সাড়া ফেলেন।

সেবার বাইরেও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে মৌলিক ও অনুবাদ রোমাঞ্চোপন্যাস প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। এটা সুস্পষ্টই কাজী আনোয়ার হোসেন ও তাঁর সৃষ্টি সেবা প্রকাশনীর সাফল্যেরই সিলসিলা। নতুন নতুন লেখক ও অনুবাদকরা বিশ্বের নানান দেশের সদ্য প্রকাশিত, পুরস্কারপ্রাপ্ত থ্রিলার অনুবাদের পাশাপাশি মৌলিক রচনাও পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন। এইসব তরুণ লেখকের ভেতর বিশেষভাবে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ইতিহাসভিত্তিক থ্রিলার রচনার ঝোঁক লক্ষ করা যায়। রোদেলা, বাতিঘর প্রকাশনীর মতো প্রকাশনাগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাতিঘর প্রকাশনীর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন অনুবাদের সাথে মৌলিক উপন্যাসও লিখছেন, যেগুলো একটা বিশেষ শ্রেণির পাঠক পছন্দ করছেন। ইদানিং বেঙ্গলবুকসও রহস্যরোমাঞ্চ সাহিত্যকে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে, যার জন্যে তারা সাধুবাদ পাওয়ার দাবিদার।

প্রতিবছর একুশে বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনীর প্রকাশিত পুস্তক তালিকা পর্যালোচনা করলেও দেশে এই মুহূর্তে রোমাঞ্চোপন্যাসের জনপ্রিয়তার পরিসর উপলব্ধি করা যাবে। এই ধারার বই এখন বিক্রির তালিকার বড় অংশ দখল করে রাখছে। থ্রিলার সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে এই জনপ্রিয়তা আরো বেগবান হয়ে উঠুক এটাই কাম্য।

লেখক : অনুবাদক

বুক রিভিউ

অভিনব উদ্ভাবন ও দ্বৈতসত্তার গল্প

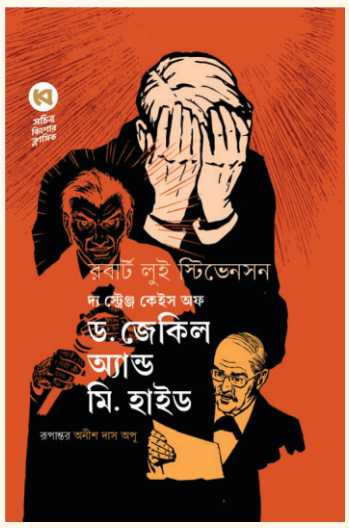

দ্য স্ট্রেঞ্জ কেইস অফ
ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড

মূল : রবার্ট লুই স্টিভেনসন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস
মূল্য : ১৮০৳

বিখ্যাত স্কটিশ লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের এক অনবদ্য রচনা 'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেইস অফ ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড'। স্টিভেনসন নাকি এই বইয়ের ধারণা পেয়েছিলেন একটি দুঃস্বপ্ন থেকে। বইটি নিয়ে কথা বলার আগে এটুকু বলে নেওয়া জরুরি যে, বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। সেই সময় দ্বৈতসত্তা নিয়ে এমন গভীর ও সুচারু গদ্যরচনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সম্ভবত এ কারণেই, প্রকাশের এত বছর পরেও বইটি বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত গ্রন্থমালায় নিজের জায়গা ধরে রেখেছে।

গল্পটি ড. হেনরি জেকিল ও মি. হাইডের। ড. জেকিল একজন গবেষণাপ্রবণ মানুষ। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি মগ্ন থাকেন। বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা বহুবার তাঁকে এসব গবেষণা থেকে বিরত থাকতে বললেও অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী ড. জেকিল বারণ শোনেন না। গবেষণা করতে করতে একসময় তিনি মানুষের দ্বৈতসত্তা সম্পর্কে এক বিস্ময়কর উপলব্ধিতে পৌঁছান। তিনি অনুভব করেন যে, একজন মানুষের ভেতর একইসঙ্গে দুটি সত্তা সক্রিয় থাকতে পারে; এবং সত্তা দুটি হতে পারে পরস্পরবিরোধী। এই ধারণা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিষয়টি প্রমাণ করার একরোখা আগ্রহে তিনি গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই গবেষণার ফলেই ড. জেকিল আবিষ্কার করেন এক বিশেষ ওষুধ। আর সেই ওষুধের প্রয়োগ তিনি করেন নিজের শরীরেই।

এখানেই আবির্ভাব ঘটে মি. হাইডের। মি. হাইডকে নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে রহস্য। কে এই হাইড? ড. জেকিলের সাথে কী এমন হৃদ্যতা তার? ড. জেকিল কেনই বা তাকে রক্ষা করে চলেন?

আসলে হাইড ড. জেকিলেরই আরেকটি সত্তা। নিজের ওপর ওষুধ প্রয়োগের ফলাফল হিসেবেই জন্ম নেয় হাইড। মানুষের দ্বৈতসত্তা যে বাস্তব এ তত্ত্ব প্রমাণ করতে জেকিল সক্ষম হন। কিন্তু প্রতিটি আবিষ্কারেরই একটি অন্ধকার দিক থাকে। এই আবিষ্কারও তার ব্যতিক্রম নয়। ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশি প্রভাব ফেলতে শুরু করে। নির্দোষ মানুষ মারা যেতে থাকে। মি. হাইড হয়ে ওঠে ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ড. জেকিলের বন্ধুরা ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কীভাবে, কেন, কখন এসব ঘটছে—তারা এসবের কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না।

শেষ পর্যন্ত হাইডের কী হয়? ড. জেকিলের জীবন কোন দিকে মোড় নেয়? জেকিল কি নিজের ভুল বুঝতে পারেন, নাকি নিজের সৃষ্ট দ্বৈতসত্তার শিকার হন তিনি নিজেই? দিনশেষে জয়ী হয় কে—হাইড, না জেকিল?

এই বইটি মনস্তত্ত্বের এক অসাধারণ উদাহরণ। বাস্তবে কোনো ওষুধ খেয়ে এক সত্তা থেকে অন্য সত্তায় রূপান্তর সম্ভব কি না, জানি না। কিন্তু প্রতিটি মানুষের ভেতরেই যে ভালো ও খারাপ সত্তা থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোন সত্তাকে আমি লালন করব, আর কাকে নিয়ন্ত্রণে রাখব সেটা নির্ভর করে আমার বিবেকের ওপরই।

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের এ রচনাটি গত দেড়শ বছর ধরে শ'য়ে শ'য়ে কিশোর-তরুণ ছাড়াও অসংখ্য বয়স্ক পাঠককে মুগ্ধ করে আসছে। 'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড' বইটি তাই চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

নীলিমা রশীদ তৌহিদা, ঢাকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ওটা ছিল আমার জীবনের প্রথম মৌলিক থ্রিলার—অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। একদল প্রত্নতাত্ত্বিক একটি দ্বীপে গিয়েছিল হীরের খনির খোঁজে। সেখানে তারা ভয়ানক বিপদে পড়ে। মানুষখেকো, একশো ফুট লম্বা অজগর, ভয়ানক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিসহ যা কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে সবকিছুর মোকাবেলা তাদেরকে করতে হয়। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলাম গল্পটি লিখতে গিয়ে। হয়তো সেদিনই ভবিষ্যতের থ্রিলার লেখক হবার বীজ রোপণ হয়ে গিয়েছিল আমার মাঝে। যদিও লেখালেখির জগতে যখন পুরোপুরি ঢুকে পড়লাম তখন থ্রিলার বই অনুবাদ আর বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে দেশি পটভূমিতে অ্যাডাপটেশনের দিকে বেশি ঝুঁকেছি।

আমি অ্যাডাপটেশনটা এমনভাবে করি যাতে আমার পাঠকরা মৌলিকের স্বাদ পান। মধ্যরাতের আতংক নামে আমার একটি হরর থ্রিলার আছে সম্পূর্ণ দেশি পটভূমিতে লেখা। বরিশাল শহর থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরের একটি মফস্বলকে নিয়ে গড়ে ওঠা গল্প। সেখানে একটি বাড়ির বর্ণনা আছে। আমার পাঠকরা ভেবেছেন ওই বাড়িটি বুঝি সত্যি ওখানে আছে। দু'জন পাঠিকা ফোন করে আমার কাছে ঠিকানা চেয়েছিলেন ওই বাড়িতে একবার ঢুঁ মারার জন্য। ঢাকার মনিপুরী পাড়াকে কেন্দ্র করে *প্রেতপুরী* নামে আমার আরেকটি রোমাঞ্চোপন্যাস আছে, যেটি সিনেমাও হয়েছে স্বপ্নের ঘর নামে, সেটি পড়েও পাঠকরা এতটা চমৎকৃত হয়েছেন, ৮/১০ মনিপুরী পাড়ার ওই ভবনে তারা যেতে চেয়ে আমাকে চিঠিও লিখেছেন (এই বইটি লেখার আগে মনিপুরী পাড়ায় বেশ কয়েকবার চক্কর মেরে এসেছি অথেনটিক বর্ণনা দেয়ার জন্য)। আবার *দুঃস্বপ্নের রাত* নামে সাইকো থ্রিলারটি পড়ে দিনাজপুরের পল্লবী নামে একটি মেয়ে এমন ভয় পেয়েছিলেন, তিনি আর বাথটাবে গোসল করার সাহস পাননি। এই তথ্য আমাকে স্বয়ং জানিয়েছিলেন মাসুদ রানার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেন। তিনি পল্লবীর চিঠিটি আলোচনা বিভাগে ছেপেও দিয়েছিলেন। ১৯৯৪'র ডিসেম্বরে দুঃস্বপ্নের রাত তাঁর সেবা প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় (এখানে অফ দ্য রেকর্ডে বলে রাখি, এই বইগুলো বেঙ্গলবুকস থেকে নতুন আঙ্গিকে পেপারব্যাকে আবার বেরোচ্ছে। যারা বইগুলো এখনো পড়েননি, পড়তে পারেন)। তো এভাবেই আমার থ্রিলারের জগতে প্রবেশ এবং পাঠকদের জন্য নিত্যনতুন থ্রিলার অনুবাদ ও অ্যাডাপ্ট করে চলেছি।

এই জনরার আবেদন...

আমি গল্প বলতে চাই। সহজ ভাষায় সেগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করি। আর অ্যাডাপটেশনের মাধ্যমে চমৎকারভাবে গল্পটা নিজের মতো করে বলা যায়, যে স্বাধীনতাটুকু অনুবাদে থাকে না

এই লেখালেখিটা আমার শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে। চর্চাটা আসলে আরম্ভ হয় ওই সময় থেকে। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন প্রকাশনী আর পত্রিকাগুলোতে আমার লেখালেখির যাত্রা চলতে থাকে এবং এখনও সেই যাত্রা অব্যাহত।

অ্যাডাপটেশনের দিকে কেন ঝুঁকলেন?

অনীশ দাস অপু : আমি গল্প বলতে চাই। সহজ ভাষায় সেগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করি। আর অ্যাডাপটেশনের মাধ্যমে চমৎকারভাবে গল্পটা নিজের মতো করে বলা যায়, যে স্বাধীনতাটুকু অনুবাদে থাকে না। তবে এই অ্যাডাপটেশনটা মূলত শিখেছি সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে। কিশোরবেলায় কাজী আনোয়ার হোসেনের তিনটি উপন্যাসিকা এবং ছায়া অরণ্য নামে দুটি থ্রিলার গল্পের বই পড়েছিলাম। জানতাম না গল্পগুলো বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে লেখা। পড়ার পর ভীষণ মুগ্ধ হই। অ্যাডাপটেশনটা তখন এমনভাবে করা হয়েছিল, লেখক মূল লেখাটি ভেঙেচুরে সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপট বানিয়ে ফেলেছেন। একদমই মৌলিকের মতো হয়ে গেছে। এমনই একটা ঘটনা বলি। একটা গল্প পড়েছি, যেখানে মূল নায়ক ভয়ানক গরিব। ওই লোকের স্ত্রী একবার তাকে ১০ টাকার নোট দিয়ে জানাল, বাড়িতে আর টাকাপয়সা নেই। এই সামান্য অর্থ দিয়েই বাকি মাস চলতে হবে। ওই লোকের মাথায় নরক ভেঙে পড়ল। সে নোটের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এই ১০ টাকার নোটটি যদি ডাবল হয়ে যেত তাহলে কতই না ভালো হতো। দেখতে না দেখতে ওখানে দশ টাকার আরেকটা নোট হয়ে গেল। ওই লোকের একটা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। সেটার ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হয়েছে। গল্পটা পড়ে আমি দারুণ মুগ্ধ হই। গল্পটা আমার কিশোরমনে এতটা নাড়া দেয়, আমি নিজেও একটা দশ টাকার নোট সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে মনে মনে বলছিলাম, আহা, এখানে যদি আরেকটি দশ টাকার নোট হয়ে যেত তাহলে কতই না ভালো হতো! তবে তা তো আর হবার নয়। এখন ঘটনাটি মনে পড়লে হাসি পায়। যাহোক, আরেকটা গল্প বলি । জি কে চেস্টারটন নামে ব্রিটিশ একজন লেখক ছিলেন। উনি ফাদার ব্রাউন নামে একটি চরিত্রের স্রষ্টা। ফাদার ব্রাউন একাধারে গোয়েন্দা এবং পাদ্রী। এই ফাদার ব্রাউনকে নিয়েই কাজী আনোয়ার হোসেন 'ওস্তাদ' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। ওই গল্পে মূল চরিত্র একজন মওলানা। পাদ্রীকে তিনি মওলানা বানিয়েছিলেন। কী দুর্ধর্ষ অ্যাডাপটেশন! পরে 'দ্য ব্লু ক্রস' নামে মূল গল্পটাও পড়েছি। আবার কাজীদার গল্পটাও পড়ে মিলিয়ে দেখেছি। দেখলাম, কাজীদা মূল গল্পটার চেয়েও অনেক ভালো লিখেছেন। এই বিষয়গুলো আমার মনে গেঁথে ছিল। সেবা প্রকাশনীর লেখকদের সমস্ত রহস্য উপন্যাস আমার পড়া। দু'একটি বাদে সবই বিদেশি কাহিনির অ্যাডাপটেশন। কিন্তু এতই মুন্সিয়ানার সাথে দেশি পটভূমিতে নতুন করে কাহিনি এবং চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে, বলে না দিলে বুঝবার উপায় নেই যে এগুলো বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে রচিত! আমার পাঠকরাও অ্যাডাপটেশন খুব পছন্দ করেন। আমি নিজেও লিখে মজা পাই। মৌলিকত্বের একটা স্বাদ পাওয়া যায়।

আপনি থ্রিলারকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?

অনীশ দাস অপু : থ্রিলার শব্দের সরল বাংলা রোমাঞ্চোপন্যাস। থ্রিলারের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে। আর সেগুলো হলো—মিস্ট্রি, হরর, গোয়েন্দা, সাসপেন্স, অ্যাকশন, ক্রাইম, এসপিওনাজ, সুপারন্যাচারাল ইত্যাদি। সবই এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত। সুবিশাল এই জনরা নিয়ে অনেকে লিখছেন। যার যেটা পছন্দ। বিশ্ব জুড়ে থ্রিলার সাহিত্যের জয়জয়কার। আমি এ পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত বহু থ্রিলার লেখকের বই অনুবাদ করেছি। এদের মধ্যে আছেন অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, জেমস হেডলি চেজ, সিডনি শেলডন, জেফরি আর্চার, জ্যাক হিগিন্স, জেমস প্যাটারসন, ক্লাইভ কাসলার প্রমুখ। এঁরা বই লিখেই কোটিপতি হয়ে গেছেন। বিশ্ব জুড়ে তাঁদের অগণিত ভক্ত।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬

স্টল : ৬১৭—৬২১

বেপরোয়া
মাসুদ আনোয়ার
মূল্য : ২৮০৳

কাসা দিয়াবলো
ফাহাদ আল আবদুল্লাহ
মূল্য : ২৬০৳

জলদস্যু
রওশন জামিল
মূল্য : ২৪০৳

বুনো সীমান্ত
মাসুদ আনোয়ার
মূল্য : ২৮০৳

নীলগিরি
রওশন জামিল
মূল্য : ২৫০৳

বসতি
রওশন জামিল
মূল্য : ২৫০৳

বুলেট কিংবা ভালোবাসায়
ফাহাদ আল আবদুল্লাহ
মূল্য : ৩৮০৳

প্রহরী
শওকত হোসেন
মূল্য : ২৬০৳

স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী
রওশন জামিল
মূল্য : ২৮০৳

প্রত্যয়
রওশন জামিল
মূল্য : ২৪০৳

প্রতিপক্ষ
শওকত হোসেন
মূল্য : ২২০৳

বাথান
রওশন জামিল
মূল্য : ২৮০৳

দখল
শওকত হোসেন
মূল্য : ২২০৳

ধূম্রজাল
শওকত হোসেন
মূল্য : ২৬০৳

ঝড়
মাসুদ আনোয়ার
মূল্য : ২৬০৳

পিস্তলেরো
আ. আজিজ
মূল্য : ২৬০৳

ফ্র্যাংক শ্যানন
শওকত হোসেন
মূল্য : ২৯২৳

স্বপ্ন উপত্যকা
মাসুদ আনোয়ার
মূল্য : ২৬০৳

+8801958519882, +8801958519883 /bengalbooks.com.bd www.bengalbooks.com.bd

বেঙ্গলবুকস

সাড়ে ৩ দিনের প·ত্রি·কা

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ২। রবিবার । ১ মার্চ ২০২৬ । ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২

জীবন থ্রিলার উপন্যাসের মতো, সাসপেন্সে ভরপুর। পরের পৃষ্ঠা ওলটানোর আগ পর্যন্ত বলতে পারবেন না যে সামনে কী ঘটছে

—সিডনি শেলডন
বিশ্বখ্যাত থ্রিলার লেখক

বি শে ষ র চ না

বাংলাদেশের সাহিত্যে থ্রিলার ঘরানা

শওকত হোসেন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনীতিসহ সমাজের অপরাপর ক্ষেত্রের মতো প্রকাশনাশিল্প ও সাহিত্যের ওপরও প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা গেছে। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, শংকর, তারাশঙ্কর, নিমাই ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা তখন অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, যার তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিলো বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্পে। সেই কঠিন সময়ে একমাত্র 'মুক্তধারা' ছাড়া দেশের আর কোনো প্রকাশনা সংস্থাই সম্ভবত সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলো না। ভারতীয় এসব লেখকের ভেতর বিশেষত নীহাররঞ্জন গুপ্ত তাঁর রহস্যোপন্যাসের সুবাদে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সৌখিন গোয়েন্দা কিরীটি রায়, তার সহকারী-বন্ধু সুব্রত আর স্ত্রী কৃষ্ণাকে নিয়ে রচিত নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্যকাহিনিগুলো পাঠকদের বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করত। পাঠকরা তাই তাঁর লেখা পছন্দ করেছিলেন।

এগুলো ছিলো নেহায়েতই 'কে-কেন-কীভাবে' কাতারভুক্ত। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের আধিপত্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মূলধারার সাহিত্যের অতিক্ষুদ্র সহযাত্রী হয়ে রহস্যরোমাঞ্চ সাহিত্যও হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে এগিয়ে চলছিল, যদিও সাহিত্যের গুণ বিচারে সেসব রচনা খুব একটা উন্নত ছিলো এমন দাবি সম্ভবত করা সমীচীন হবে না।

দেশ স্বাধীনতা লাভের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ধীরে ধীরে রহস্যরোমাঞ্চ ঘরানার সাহিত্যধারা মূলধারার পাঠকদের রুচির নাগাল পেতে শুরু করে বলে মনে হয়। ১৯৬৫/৬৬ সালে বাংলাদেশের রহস্যরোমাঞ্চ সাহিত্যের পথিকৃৎ নির্মুকুট সম্রাট কাজী আনোয়ার হোসেন (১৯ জুলাই ১৯৩৬—১ জানুয়ারি ২০২২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর পর গড়পড়তা বাঙালির মতো চাকরির পিছু ধাওয়ার পরিবর্তে নিজেই সেগুনবাগান প্রেস (পরবর্তীতে সেবা প্রকাশনী) নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে বসেন। তখনই যেন এ ভূখণ্ডের রহস্যরোমাঞ্চ সাহিত্যের খোলনলচে পাল্টে যাওয়ার অমিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।

এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

সা ক্ষা ৎ কা র

এই জনরার আবেদন বিন্দুমাত্র ম্লান হবে না

—অনীশ দাস অপু

অনীশ দাস অপু হরর এবং থ্রিলার অনুরাগী পাঠকদের কাছে একটি প্রিয় ও সুপরিচিত নাম; জন্ম ৫ ডিসেম্বর, বরিশালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাতকোত্তর এই লেখক-অনুবাদক ছাত্রজীবনেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে অনুবাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এ পর্যন্ত ৫০টির বেশি প্রকাশনা সংস্থা থেকে সাড়ে চার শতাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। বেশিরভাগই হরর এবং থ্রিলার। তবে তিনি অসংখ্য ক্ল্যাসিক, নন-ফিকশন এবং সায়েন্স ফিকশনও অনুবাদ করেছেন। *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার* জন্য পাঠকপ্রিয় এ লেখক-অনুবাদকের মুখোমুখি হয়েছিলেন **আমিরুল আবেদিন**

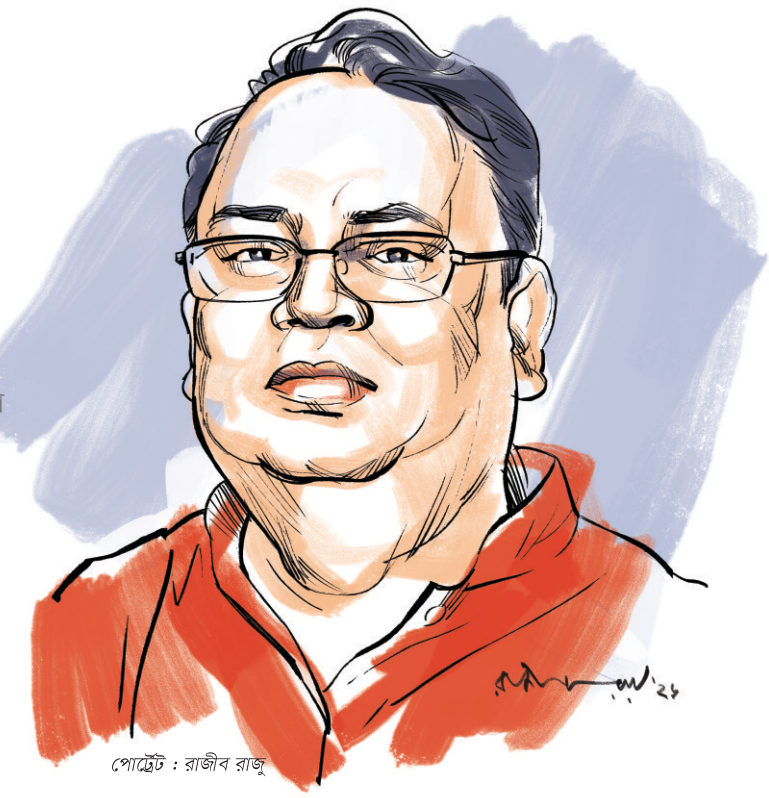

পোর্ট্রেট : রাজীব রাজু

আপনার লেখালেখির জগত বিচিত্র। তবে তরুণ প্রজন্মের একাংশ আপনাকে মৌলিক থ্রিলার লেখক হিসেবেও চিহ্নিত করে। আপনি থ্রিলারের জগতে কীভাবে এলেন?

অনীশ দাস অপু : প্রথমেই একটা কথা স্পষ্ট করে নিতে চাই। আমি কিন্তু মৌলিক থ্রিলার লেখক না। আমি সবসময় বলি আমি যখন থ্রিলার লিখি তখন অ্যাডাপটেশন কিংবা অনুবাদ করি। তবে মৌলিক যে একেবারে লিখিনি তা নয়, সংখ্যায় অল্প। থ্রিলার বা রোমাঞ্চ কাহিনি ছোটবেলা থেকেই আমাকে টানত। আমাদের বাসায় *দস্যু মোহন* এবং *কুয়াশা* সিরিজের অনেক বই ছিল। এছাড়া কলকাতার দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত *যখের ধন*, *আবার যখের ধন*, *মিসমিদের কবচ* ইত্যাদি বইগুলো গোগ্রাসে গিলতাম। আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল বিভূতিভূষণের *চাঁদের পাহাড়*। অসংখ্য কিশোরের মতো আমিও এই বইটি পড়ে কল্পনায় কতবার যে আফ্রিকার সেই বরফঢাকা পাহাড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম তার হিসাব নেই। দেবসাহিত্য কুটিরের টারজান সিরিজের মনোলোভা প্রচ্ছদ আমাকে দারুণ টানত। টারজান পড়ে আমি আফ্রিকার গহীন অরণ্যে চলে যেতাম। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় আমার বাবা একদিন আমাকে 'দ্য ল্যান্ড দ্যাট টাইম ফরগট' সিনেমাটি দেখিয়েছিলেন। আমার মনোজগতে রীতিমত তোলপাড় তুলেছিল ওই মুভি। আমি এতটাই অভিভূত হয়ে যাই, একদিন 'দ্য ব্ল্যাক আইল্যান্ড' নামে একটি অ্যাডভেঞ্চার গল্প লিখে ফেলি।

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

ক লা ম

থ্রিলার ও রিয়ালিজম

লিংকন হাসান

থ্রিলার নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে। এ জনরার পাঠক হিসেবে অবশ্য আমরা অনেকেই এত সূক্ষ্মভাবে ভাবি না। বলা যায়, এটি সাহিত্যের এমন এক শাখা, যেখানে অনেক কিছু ঘটে বা অন্তত কিছু না কিছু ঘটে। থ্রিলারের কাহিনিতে নানা চড়াই-উৎরাই থাকে। সমকালীন সাহিত্য বলুন বা প্রেমের উপন্যাস—একেবারেই আলাদা এটি। সচরাচর সমকালীন লেখায় পাতার পর পাতা ভর্তি কথোপকথন থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের উপন্যাসে ঘটনাপ্রবাহ অল্পই এগুতে পারে। থ্রিলার বেশি পড়া হয় কারণ এ ধরনের লেখায় কাহিনির বৈচিত্র্য অনেক বেশি। কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয় গবেষণা, ইতিহাস ও ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি। আমার বিশ্বাস যে, ন্যূনতম মাত্রার গবেষণা ছাড়া ভালো মানের সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার, হিস্টোরিক্যাল থ্রিলার, স্পাই বা এসপিওনাজ থ্রিলার, মেডিক্যাল থ্রিলার, ক্রাইম থ্রিলার, পোলিস প্রোসিডিউরাল থ্রিলার, এমনকি স্ল্যাশার থ্রিলারও লেখা সম্ভব না। সেরকম কিছু আমি অন্য জনরাতে তেমন একটা পাই না বললেই চলে। থ্রিলারে এই তথ্যভিত্তিক যে রিয়ালিজমের ছোঁয়াটুকু থাকে, সেটার কারণেই এ জনরা আমার কাছে বেশি উপভোগ্য মনে হয়।

থ্রিলারের জনপ্রিয়তা এখন অনেক বেড়েছে। এক সময় থ্রিলার সাহিত্য বাংলাদেশে অ্যাডাপটেশনের মাধ্যমে আসত। এখনও হয়। তবে অনেকে মৌলিক থ্রিলার লেখারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু একটা বিষয় উপলব্ধি করা জরুরি। মৌলিক থ্রিলার রচনা হচ্ছে খুব কম। অনুবাদ হওয়া থ্রিলারের সাথে যদি দেশের সব মৌলিক থ্রিলারের অনুপাতও হিসাব করি

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : মাহমুদুল হাসান | **সম্পাদক :** আজহার ফরহাদ
সম্পাদনা পর্ষদ : তৌহিদ ইমাম, আমিরুল আবেদিন আকাশ, রাশেদ সাদী, আরিফুল হাসান
অলংকরণ : লুৎফি রুনা, রাজীব রাজু, রাজীব দত্ত | **গ্রাফিক ডিজাইন :** সাইফুল সাগর, ফয়সাল মাহমুদ, মাহমুদ মিজু

বেঙ্গলবুকস-কিন্ডারবুকস নিবেদিত একটি বইমেলা প্রকাশনা। প্রকাশক কর্তৃক নোভা টাওয়ার ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট ওয়ার্কস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮২, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩ ● ইমেইল : info@kinderbooks.com.bd, info@bengalbooks.com.bd ● ওয়েব : www.kinderbooks.com.bd, www.bengalbooks.com.bd